ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

যুগোপযোগী ওষুধনীতি জরুরি

দেশে ওষুধ নিয়ে নানামুখী বিশৃংখলার অভিযোগ অনেক দিন ধরেই। উৎপাদন ক্ষেত্রে ওষুধের গুণগতমান সংরক্ষণ, ওষুধ ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ, ক্রয়-বিক্রয়, প্রচারণা, চিকিৎসক ও ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে বড় ধরনের সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সব মহল থেকেই বলা হচ্ছে যুগোপযোগী ওষুধনীতি প্রণয়নের কথা। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে পরিষ্কার অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু সরকারের মেয়াদের ছয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। আমরা মনে করি, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী একটি ওষুধনীতি প্রণয়ন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। কেবল সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বলে নয়, দেশ ও মানুষের স্বার্থেই এটা করতে হবে। আমরা আশা করব যত দ্রুত সম্ভব একটি কার্যকর ও গণমুখী ওষুধনীতি প্রণীত হবে।

দেশে প্রথম ওষুধনীতি প্রণীত হয়েছিল ১৯৮২ সালে। অনেকের মতো আমিও মনে করি গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে সামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে তখন একটি ফলপ্রসূ ও যুগোপযোগী ওষুধনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে স্বার্থান্বেষী মহল, বিশেষ করে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসকদের দাপট বাড়ে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংঘাতও বাড়ে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ২০০৫ সালের 'ওষুধনীতির' আদলে একটি 'শিল্পনীতি' প্রণয়ন। ১৯৮২ সালের ওষুধনীতি ছিল গণমুখী ও শিল্পবান্ধব। ২০০৫ সালের ওষুধনীতি শিল্পবান্ধব হলেও তা ছিল সম্পূর্ণ জনস্বার্থবিরোধী। বিএনপি সরকারের আমলে প্রণীত ওই ওষুধনীতিতে রোগী ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিন্দুমাত্র বিবেচনায় না নিয়ে ওষুধ শিল্প মালিকদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ২০০৫ সালের ওষুধনীতি প্রণয়ন কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল ওষুধ কোম্পানির মালিক। ১৯৮২ সালে জাতীয় ওষুধনীতি প্রণীত হওয়ার আগে বাজারে প্রচলিত চার হাজারের বেশি ওষুধের অধিকাংশই ছিল অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ও ব্যবহার অনুপযোগী। ভিটামিন, টনিক, এলকালাইজার, এনজাইম, হজমিকারক, কফ সিরাপসহ আরও বহু ওষুধ নামের জঞ্জাল বিক্রি করে দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলো কোটি কোটি টাকা উপার্জন করত। অথচ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ও সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। ওষুধের দামের ওপর কারও কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৯৮২ সালের ওষুধনীতির হালনাগাদ সংস্করণ হিসেবে আখ্যায়িত করে এ ওষুধনীতি প্রণয়নের ফলে আগের বিশ্বনন্দিত ও সর্বজন প্রশংসিত ওষুধনীতিটির কবর দিয়ে দেয়া হয়। ২০০৫ সালের ওষুধনীতির কারণে বাতিল ও নিষিদ্ধ ওষুধ আবার বাজারে ফিরে আসে এবং এর ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলো প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর, অকার্যকর ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হয়। বাজারভর্তি অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর, অকার্যকর ও ব্যবহার অনুপযোগী ওষুধ কিনতে গিয়ে মানুষ সর্বস্বান্ত হতে শুরু করে।

প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করা গেলে অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর, অকার্যকর ও ব্যবহার অনুপযোগী ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি করে গরিব মানুষ ঠকানোর কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না বিধায় ২০০৫ সালের ওষুধনীতি প্রণীত হওয়ার পর থেকেই আমরা নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা একটি যুগোপযোগী ওষুধনীতি প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছি। এমন একটি ওষুধনীতি দাবি করে আসছি যাতে ওষুধ উৎপাদক ও দেশের জনসাধারণের স্বার্থ সমভাবে সংরক্ষিত হয়। কিন্তু সেই দাবি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আমরা আশা করেছিলাম, এবার হয়তো একটি সার্থক ও কার্যকর ওষুধনীতি প্রণীত হবে। জাতীয় দৈনিকের উপরোক্ত প্রতিবেদন পড়ে আশা ভঙ্গ হল। জানি না একটি যুগোপযোগী ওষুধনীতি আদৌ আলোর মুখ দেখবে কি-না।

১৯৮২ সালের যুগান্তকারী ওষুধনীতির সুবাদে এবং ২০০৫ সালের ওষুধনীতিতে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা বাতিল ও নিষিদ্ধ ওষুধ আবার বাজারে প্রবেশের কারণে কিছু দেশীয় কোম্পানির অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান ওষুধের বাজার ১২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে বলে সূত্রমতে জানা যায়। দেশীয় ওষুধ শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতির কারণে ওষুধ উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও গত ৩২ বছরে অতীতে প্রণীত ওষুধনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে অন্যতম ছিল অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য সুলভ মূল্যে গুণগতমানসম্পন্ন ওষুধপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। ওষুধ প্রস্তুতকারকরা প্রায়ই বলে থাকেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ওষুধের দাম কম। কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশে ওষুধের দাম কম হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশে ওষুধের উৎপাদন খরচ অনেক কম। দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশের একজন মানুষের গড় উপার্জন বাংলাদেশের একজন মানুষের গড় উপার্জনের চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশে ২৬৫টি ওষুধ কোম্পানির মধ্যে মাত্র ৩০-৪০টি কোম্পানি গুণগতমানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন করে। বাকি কোম্পানিগুলোর ওষুধের গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কিছুদিন আগে জিএমপি (গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস) অনুসরণ না করে নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন করায় ৩২টি কোম্পানির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আরেকটি জাতীয় দৈনিকে 'ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের মান নিয়েই প্রশ্ন' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে হচ্ছে না। কিছু ওষুধ কোম্পানির তৎপরতা, অনৈতিক অর্থের লেনদেন ও ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে নিম্নমান ও ভেজাল ওষুধও হয়ে গেছে 'মানসম্মত'। সরকারি ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির আধুনিকায়ন কাজ চলছে ধীরগতিতে। জানা যায়, ঢাকার একমাত্র ল্যাবরেটরিতে বছরে সর্বোচ্চ ৪ হাজার স্যাম্পল বা ওষুধের নমুনা পরীক্ষা করা যায়। অথচ বাজারে প্রায় ২৪ হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধ প্রচলিত আছে। তাই বিপুলসংখ্যক ওষুধ থেকে যাচ্ছে পরীক্ষার বাইরে। ওষুধনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ ব্যর্থতার দায়ভার কে বহন করবে, কেউ এ ব্যাপারে সদুত্তর দিতে পারে না।

সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের চাহিদা পূরণ হয়েছে। বাস্তবতা কি তাই? শহর ও গ্রামাঞ্চলের সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোয় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা একাধিক জরিপ চালিয়ে দেখতে পাই, বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র ও থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোয় গড়ে ৫০ শতাংশের বেশি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সরবরাহ থাকে না। এর কারণ হতে পারে বাজেট স্বল্পতা, ভ্রান্ত গুদামজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা, অব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও জটিলতা। এছাড়া সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ওষুধ সরানো ও চুরি এখন আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়।

১৯৮২ সালের ওষুধনীতিতে ১৫০টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রেসক্রাইব করার জন্য আরও ১০০টি ওষুধসহ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ নির্ধারণ করা হয় ২৫০টি। ২০০৫ সালে ওষুধনীতিতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের কোনো তালিকা করা হয়নি। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ মোতাবেক অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা তৈরি ও প্রকাশ করা ওষুধনীতির অপরিহার্য অঙ্গ। ১৯৮২ সালের ওষুধনীতিতে মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করা হয়। পরবর্তীকালে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তবলে ঘোষণা করা হয় সরকার ১১৭টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করবে। বাকি সব ওষুধের মূল্য নির্ধারণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে ওষুধ কোম্পানিগুলো। ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের এক কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, ওষুধের দাম নির্ধারণে এখন ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের আর বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। কোম্পানিগুলো ওষুধের যে দাম ঠিক করে দেয় প্রশাসন তাই বহাল রাখে। এতে করে কিছু অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ছাড়া বাকি সব ওষুধের দাম কোম্পানিগুলো ইচ্ছামতো নির্ধারণ করছে। এর ফলে গত এক বছরে ওষুধের দাম তিন থেকে চার গুণ বেড়েছে। চড়াদামে ওষুধ কিনতে গিয়ে অসহায় দরিদ্র মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করে, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা বাতিল ও ওষুধ কোম্পানিগুলোকে মূল্য নির্ধারণের অবাধ স্বাধীনতা প্রদান ওষুধনীতির মূলনীতির পরিপন্থী। উন্নত বিশ্বের বহু দেশে ওষুধ কোম্পানিগুলো মূল্য নির্ধারণে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে না। ওসব দেশেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রচলিত আছে।

ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার বিশ্বের বিশেষভাবে অনুন্নত বিশ্বের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ওষুধের অযৌক্তিক ও ঢালাও ব্যবহার আমাদের শরীরে মারাত্মক ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ওষুধ দেয়া বা নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা ওষুধনীতির অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। উন্নত বিশ্বে ওষুধ ক্রয়-বিক্রয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ওসব দেশে ইচ্ছা করলেই যেকোনো ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেনা যায় না। আমাদের দেশে ওষুধ ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো নীতি নেই, তাই নিয়ন্ত্রণও নেই। তাই ওষুধের অপব্যবহার ও অযৌক্তিক ব্যবহার শুধু স্বাস্থ্যঝুঁকি নয়, মৃত্যুর কারণ হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৮২ সালের ওষুধনীতিতে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের সুস্পষ্ট নীতিমালা ও অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু তা কখনও বাস্তবে রূপ নেয়নি।

বহুদিন ওষুধ প্রশাসন পরিদফতর হিসেবে কাজ করেছে। এখন পরিদফতর অধিদফতরে রূপান্তরিত হয়েছে। ওষুধ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা এখন 'ডিরেক্টর'-এর পরিবর্তে 'ডিরেক্টর জেনারেল'। কিছু লোকবল বৃদ্ধিসহ ছোটখাটো পরিবর্তন ছাড়া ওষুধ প্রশাসনের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমি কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার কথা বলছি। লোকবলের অভাবের কথা ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর থেকে প্রায়ই শোনা যায়। লোকবলের সমস্যাটি একমাত্র সমস্যা নয় ওষুধ প্রশাসনের। এ প্রসঙ্গে সদিচ্ছা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিকতার প্রশ্নটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে এটা সত্য, ওষুধ প্রশাসনের অসংখ্য সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কোনো সরকারই কোনো সময় গুরত্বসহকারে বিবেচনায় নেয়নি। এটি সরকারের শুধু ব্যর্থতা নয়, চরম দায়িত্বহীনতাও বটে। দেশের অসংখ্য ওষুধ কোম্পানির লাইসেন্স প্রদান, রেসিপি পাস, ওষুধের গুণগতমান নির্ণয়, বাজারজাতকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দুই লক্ষাধিক ওষুধের দোকান তদারকি, নকল, ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের ওপর প্রখর নজরদারি— এসব ছোটখাটো বা তুচ্ছ কাজ নয়। আমরা মনে করি, কোনো নতুন ওষুধনীতি প্রণয়নের আগে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরকে ঠিক করা দরকার। প্রশাসনে কী কী সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা আছে তা আগে নিরসন একান্ত জরুরি। আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির আওতায় ওষুধনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার জন্য কারিগরি সহায়তাসহ সৎ, সাহসী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল না থাকলে সেই ওষুধনীতি কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না, ২০০৫ সালের তথাকথিত ওষুধনীতির মতো কেবল ভোগান্তিই বাড়াবে।

পরিশেষে একটি কথা বলব, ওষুধনীতি করতে হলে তা শুধু রাজনৈতিক নয়, বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই করা দরকার। রাজনৈতিক বা স্বার্থান্বেষী মহলের চাপে পড়ে বা ওই মহল কর্তৃক ওষুধনীতি প্রণয়ন করা হলে তা সেই বিশেষ মহলের স্বার্থই শুধু সংরক্ষণ করবে। সেই নীতিতে এ দেশের অসহায়, নিরীহ ও দরিদ্র মানুষের চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে না।

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : *অধ্যাপক, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
drmuniruddin@gmail.com